পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্নতার যোগাযোগ / "কবিতা স্মৃতি সিনেমা"

জীবন যে নতুন ক'রে জটিল হচ্ছে এমন নয়। তার আরো কাছে আসতে চেয়ে জটিলতর হচ্ছে কবিতা। হাজারো অন্যতর শিল্প, প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনার আস্তর প'ড়ে যাচ্ছে একটার ওপর আরেকটা। আর এতে কিন্তু একটা মজাও হচ্ছে। অর্থকরী কারণে, খ্যাতি যশের নেশায় যারা কবিতার গোলার্ধে আসেননি ; যাদের পুরস্কারের প্রত্যাশা নেই ; বন্ধুবান্ধব জোটাতে, প্রথাগত সমাজের বাইরে এক জবরদস্ত সামাজিকতার সন্ধানে যারা কবিতার গা ঘেঁষেনি ; বেড়াতে যাবার সঙ্গী খুঁজে যারা কবি নন ; শুধু শব্দ নিয়ে, বাক্য নিয়ে নানারকম নতুন খেলা, নতুন ধাঁধাঁর নেশায় যারা কবি, তাদের দলে নাম লিখিয়েই আমার এবারের কাহিনি শুরু। অবশ্য একটা কাহিনি ঠিক নয়। তিনটে। কি চারটে। তবে শাখানদীর মতো তারা এক জায়গায় গিয়ে ঠিক মিশবে। অন্তত এই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

শুরুর গল্পটা আগে অন্যত্র বলা হয়ে গেলেও আর একবার তার সারসংক্ষেপ জরুরী। প্রায় বছর পাঁচেক আগে, ২০০৭-এ সিনসিন্যাটি শহরে আচমকাই আমার আলাপ হয়ে যায় এক প্রায়-সমবয়সী অনভিজ্ঞ মার্কিন কবির সাথে। প্যাট ক্লিফর্ড (Pat Clifford)। তার কিছু কবিতার চটি বই আছে। কম লেখে। কিন্তু খুব চূড়ান্তভাবে পরীক্ষাবিলাসী এক লেখক। মাস ক'য়েক দোস্তির পরেই একদিন প্যাট যৌথ কবিতা রচনার আহ্বান জানায় - কোলাবোরেটিভ পোয়েট্রি। একটা কবিতা দুজনে লিখতে ব'সে বুঝতে পারি সে খুব ভিন্ন ধরণের কবি। আমার চেয়ে। সমাজনীতি, রাষ্ট্রজ্ঞান, রাজনীতিচেতনা, দারিদ্র্য, বাস্তুহীনতা, অনুন্নয়ন, ভাষাকবিতা - এসব তার আগ্রহের জায়গা। আর আমার ঘোরের সূত্র সম্পূর্ণ আলাদা - শিল্পতত্ত্ব, নান্দনিকতা, মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, প্রেম, যৌনতা, চলচ্চিত্র প্রভৃতি। প্যাটও সেটা বুঝতে পারে। ফলে আমরা ঠিক করি একটা কমন সূত্র না থাকলে আমাদের পক্ষে একসঙ্গে লেখা মুশকিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হয় ফিল্মকে ভিত্তি ক'রে আমরা কাজ করবো।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার আগ্রহ বাড়ছিলো। একদিন সে সত্যজিত রায়ের ছবি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' দেখে মুগ্ধ হয় ও সেই ছবিকে কেন্দ্র ক'রে আমরা একটা দ্বিভাষিক যৌথকবিতার বই লিখি। নাম দেওয়া হয় - 'চতুরাঙ্গিক/SQUARES'। কোনোরকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই বইটা মোটামুটি আকর্ষণ অর্জন করে। আমরা একটু অবাকই হই। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ইস্রায়েলের কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বইটা কেনে। দ্বিভাষিক যৌথকবিতার বই, তাও এতটা ভিন্ন সংস্কৃতির বাঁধনদার, বোধহয় খুব বেশি নেই। চলচ্চিত্রভিত্তিক হওয়ায়, বিশেষত সত্যজিতের ছবিকে সূত্র করাতেও হয়তো কেউ কেউ আগ্রহী হন। মার্কিন ভাষাকবিতার প্রধানতম কবি চার্লস বার্নস্টাইনও আগ্রহী হন বইটা সম্বন্ধে এবং একটা চমৎকার ব্লার্ব লিখে দেন। প্যাট উৎসাহী হয়ে ওঠে। অবিলম্বে দ্বিতীয় প্রকল্পের কথা আসে। এবারেও একটা ছবিকে অবলম্বন ক'রে লেখার কথা হয়। প্রশ্ন ওঠে - এবার কোন ছবি ?

বাবা ও মামার হাত ধ'রে, সাবালক হবার আগেই, ১৯৭০ দশকের কলকাতা শহরে আমি কিছু কিছু ফিল্ম ক্লাবের ছবি দেখতে শুরু করি। দেখার কথা নয়। কিন্তু মান্য সদস্যের সঙ্গের বাচ্চাকে টিকিট চেকার সবসময়েই ছেড়ে দিতো। এইভাবে একদিন গোর্কি সদনে সেসময়ের বিখ্যাত (প্রাপ্তবয়স্ক) রুশ ছবি 'জিপসি ক্যাম্প ভ্যানিশেস ইন্টু দ্য ব্লু'-ও দেখা হয়ে যায়। আরো ছেলেবেলায় লেকটাউন অঞ্চলে ছোটোমামার এক টিকিট চেকার বন্ধু সিনেমা হলের খালি সীটে আমায় বসিয়ে দিয়ে আসতেন। কখনো মাঝের থেকে, কখনো শেষের দিকের কয়েক রীল ছবি এইভাবে দেখতাম। হিন্দী ছবি। কখনো ইংরেজি ছবি। কোনোটারই নাম জানতাম না। কিন্তু মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ছায়াছবির প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ তৈরি হয়। যাদবপুরে পড়তে ঢুকে ফিল্ম ক্লাবের সদস্য হই। আর সেখানেই, ১৯৮৪ সালের বসন্তে দেখি কুবান ছবি 'অনুন্নয়নের স্মৃতি' (Memories of Underdevelopment)।

আজো মনে পড়ে সে সন্ধ্যা ছিলো ভয়ংকর গুমোট। গরম। অধুনালুপ্ত 'গান্ধী ভবন'-এ ছবিটা দেখি। সে ভবনকে ঠিক সিনেমা হল বা থিয়েটার বলা চলা না কোনোভাবেই। তার ওপর অজস্র মান্ধাতা আমলের প্রায়-বেচাল পাখা সশব্দে ঘোরে। ছেলেমেয়েরা হলের মধ্যেই অকাতরে সিগারেট খায়। এই সমস্ত বিড়ম্বনার ধোঁয়ামেঘ ভেদ করেই ছবিটা আমার কাছে পৌঁছয়। আর ভয়ানকভাবে গ্রাস করে। সে সময়ে, আশীর দশকের মাঝামাঝি, দারিদ্র্য, জনজীবনের অনুন্নয়ন, বিদ্যুতাভাব, উদ্বাস্তু ও রাজনৈতিক সমস্যা ৭০ দশকের চেয়ে ক'মে এসেছে ঠিক, কিন্তু চ'লে যায়নি। শহর এইসব সমস্যায় তখনো সমাকীর্ণ।

কলকাতার যে কোন তরুণ তরুণীর পক্ষে 'অনুন্নয়নের স্মৃতি'র সাথে নিবিড়, আত্মিক এক যোগ খুঁজে পাবার অনেক স্বাভাবিক কারণ ছিলো। হয়তো আজো আছে।

১৯৬৮ সালে তমাস আলেয়ার তোলা এই ছবিটা কলকাতায় বহুবার দেখানো হয়েছে, হয়তো আজো হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুন্নয়নের স্মৃতি অল্পদৃষ্ট। এর পেছনে অনেক রাজনৈতিক কারণ ছিলো। সে সম্বন্ধে পরে একাধিক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে। থিসিস লেখা হয়েছে। কম্যুনিজ্‌ম, কাস্ত্রো ও কুবান মিসাইল ক্রাইসিসের কারণে শুধু আলেয়া নন, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য চলচ্চিত্র পরিচালকদের ছবি আমেরিকায় দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে। উমবার্তো সোলাস, সারা গোমেজ বা পাস্তর ভেগা'র ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কখনো বেসরকারি দায়িত্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উৎসবে তাদের ছবি দেখানো হলেও, মার্কিন সরকারের স্টেট-ডিপার্টমেন্ট পরিচালক, কলাকুশলীদের সেদেশে আসার ভিসা দিতেন না। যেবার উমবার্তো সোলাসের ৬৮ সালের ছবি 'লুসিয়া' দেখানো হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, সরকারি কিছু এজেন্ট হলে বোমা মারার হুমকি দেয়। পরে শোয়ের সময় রাশিরাশি সাদা ইঁদুর হলে ছেড়ে দিয়ে শো পন্ড করা হয়। সেই শোয়ে ২২টা দেশের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও এইসব অশালীন ক্রিয়াকলাপ। মার্কিন গণমাধ্যমও সেসময়ে চূড়ান্ত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে।

এমনিতেই আমেরিকায় আন্তর্জাতিক আগ্রহ কি সমান্তরাল ধারার চলচ্চিত্রের ধারণা নতুন, তাও এছবির এমন কুখ্যাত অতীত, তায় বামপন্থী, ও পরিশেষে কাস্ত্রো-জমানার কুবান - এসমস্ত কারণে "অনুন্নয়নের স্মৃতি" সেদেশে আজো অল্পপরিচিত। আর সেই কারণেই প্যাট আরো জোরালোভাবে ছবিটার পক্ষ নিলো। পরীক্ষাশিল্পী সবসময়েই তার লেখার জন্য নতুন উপাদান খোঁজে। নতুন অজানা সূত্র।

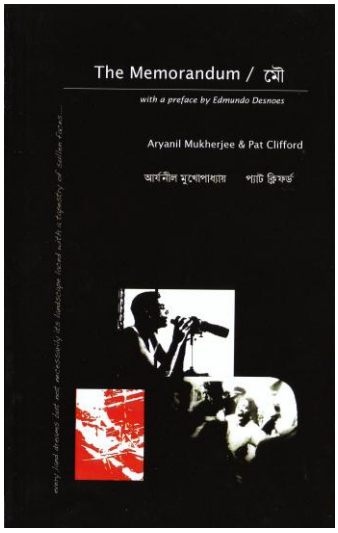

আমাদের যৌথ কবিতার নতুন বই 'The Memorandum/মৌ'। প্রকাশক কৌরব। ভূমিকা - এদমুন্দো দেসনোয়েস। প্রচ্ছদ- মধুজা মুখোপাধ্যায়। দ্বিভাষিক এই বইটা লেখা শুরু হয় ২০০৯ সালের বসন্তে। ২৫ বছর পর 'অনুন্নয়নের স্মৃতি' আবার দেখার পর। যুক্তরাষ্ট্রের রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছবিটার ডিভিডি প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে এক প্রামাণ্য বই, যাতে দেসনয়েসের মূল উপন্যাস, ছবির চিত্রনাট্য, একাধিক প্রবন্ধ, চিঠি, আলেয়ার সাক্ষাতকার সংকলিত। 'অনুন্নয়নের স্মৃতি' ছবি থেকে কিছু দৃশ্য বেছে নিয়ে, সেই ফিল্মাংশ সম্পাদনা ক'রে এক কোলাজ তৈরি করি। এই কোলাজের অনুপ্রেরণায় লেখা হয় বইয়ের তিনটে পরিচ্ছেদ। সাহিত্য ও সিনেমার চিরাচরিত সম্পর্ককে উল্টে দিয়ে - সিনেমা অনুপ্রাণিত কবিতা। এমন এক কবিতা, যা না ব'লে দিলে, প'ড়ে ধরা প্রায় অসম্ভব এ 'অনুন্নয়নের স্মৃতি' থেকে লেখা। ২০০৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সেমিনারে আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা ঐ ফিল্ম-কোলাজ সহযোগে প্রথম তিনটে পরিচ্ছেদ আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত কবি/অধ্যাপকদের পড়ে শোনাই। আগ্রহ বাড়ে। এগিয়ে চলে আমাদের লেখালিখি। 'অনুন্নয়নের স্মৃতি'-র থেকে যে ফিল্ম-কোলাজ নির্মাণ করি সেটা ইউ-টিউবের এখানে দেখা যায় -http://youtu.be/YX7mwlpahBM ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের উপন্যাস 'যুবকযুবতীরা'-য় এক পুরুষ চরিত্র ছিলো ; এক আপাতগম্ভীর যুবক, যে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একদিন ছাদে সাজানো একটা সুন্দর ফুলেল টব, সকলের অজান্তে নিচের রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিয়ে আসে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'চাইবাসা চাইবাসা' কাহিনীতেও 'সন্দীপন' চরিত্রের (যা সন্দীপনের মতে লেখক স্বয়ং) মধ্যেও ঐরকম আপাত ঔদাসীন্যের মলাটে একটা নিষ্ঠুরতা ছিলো - ট্রেন কামরার মাটিতে শুয়ে থাকা অসহায় যুবতী আদিবাসী মেয়ের শরীরের কোনে কানাচে খোঁচা দিয়ে, তাকে অকারণে কোনঠাসা ক'রে তোলে - যৌননিগ্রহই - এবং সেটা সে উল্টোদিকের বাঙ্কে শুয়ে থাকা বন্ধু 'সুনীল'-এর সামনেই করে। ১৯৯৭ সালে শীতের কলকাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার নিই। সেখানে এইসব প্রসঙ্গ আসে। এই নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যার খোঁজ। সুনীল বলেছিলেন - 'ওগুলো নিষ্ঠুরতা ততোটা নয়, আসলে বিচ্ছিন্নবাদিতা'।

কথাটা ঠিক। এই বিচ্ছিন্নকামিতা ৬০-৭০-৮০-র দশকের বাঙালী যুবকযুবতীর মধ্যে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে আবহমান ছিলো। সমাজের প্রায় প্রত্যেক স্তরে অনগ্রসরতা, অসততা, অশিক্ষা ; রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে, পশ্চিমী শিক্ষাভিতের তথাকথিত পোক্ত জমির সাথে ভঙ্গুর বাস্তবের চুরমার বিখন্ডতা, হয় চাকরির অভাব, নয় সমঝোতা ; মাদক ও যৌনতার হয় চূড়ান্ত অভাব নয় আতিশয্য - এই সমস্ত বিস্তর উঁচু নিচুর তীব্র অসঙ্গতির মধ্যে প'ড়ে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের,

বিশেষত বুদ্ধিমান ও ঋদ্ধিকামি মানুষের মধ্যে একটা বিবেকহীন অনৈতিকতা, উদাসীনতার মুখোশ নেয়। মানুষ নিজের কাছে নিজেকে আড়াল করতে থাকে, নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে থাকে। জীবনের সঙ্গে বেশিক্ষণ কিছুতেই যুক্ত থাকতে পারেনা। এই রকমই এক চরিত্র 'অনুন্নয়নের স্মৃতি'র সেরজিও।

ফিল্ম শুরু হয় বে-অফ-দ্য-পিগ্স (Bay of the Pigs) এর সময়ে। ফিদেল কাস্ত্রোর গণ-আন্দোলনের পর পরই। যাকে যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় 'কুবান মারণাস্ত্র সংকট' (Cuban Missile Crisis) - সে সময়ে। আমেরিকার সাথে আসন্ন যুদ্ধের ভয়ে অজস্র মানুষ প্রতিদিন লা হাবানা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে অন্যত্র, বিশেষ ক'রে আমেরিকায়। সেরজিওর নিজের পরিবারও চ'লে যায়। কিন্তু সে থেকে যায়। আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থক হ'য়ে ততোটা নয়, বরং নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে থেকে গিয়েই। স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক শেষের দিকে তেতো হ'য়ে উঠছিলো। ফলে এখন, স্ত্রীর অবর্তমানে, সেরজিও সারাক্ষণ সঙ্গিনী খোঁজে। কিন্তু কারো সাথেই সেভাবে নিজেকে 'কমিট' করতে পারে না। এক সময়ে নিম্নবিত্ত পরিবারের এক ভাগ্যসন্ধানী, মরিয়া সপ্তাদশীকে সে প্রায় রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় ফ্ল্যাটে। তাকে নিয়ে নানা জায়গায় যেতে শুরু ক'রে। বিছানায় তো বটেই। মেয়েটির ব্যবহারও অসঙ্গতিতে ঠাসা। এই সে আহ্লাদে বেসামাল, সম্ভোগসুখে ছটফটে, পরের মুহূর্তে সে পাপবোধে কেঁদে গঙ্গা। ছবির এই রকমই একটা সময়ে নায়ক সেরজিও অফ ভয়েসে ব'লে ওঠে, ' ওর ব্যবহারে এই যে অসঙ্গতি, এটাই অনুন্নয়নের উপসর্গ'। আর ঠিক এখানেই 'মেমোরীস অফ আন্ডারডেভালাপমেন্ট' ছবিটার প্রতি আমার ভালোলাগা তুঙ্গে ওঠে। ২৫ বছর পরেও সেই দৃশ্যটার কথা ভুলতে পারিনি। কিন্তু ২৫ বছর পর এই দৃশ্যের গভীরে আবার এমন ক'রে ডুবে যাবো - এও ভাবিনি কোনোদিন।

The Memorandum/মৌ বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে পাঠের আসরে আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও প্যাট ক্লিফোর্ড।
ছবি ঃ মিচেল ক্লিফর্ড

যৌথকবিতা লেখার নানা পদ্ধতি আছে। যৌথ লেখালিখির শুরুর দিকে আমি ও প্যাট এ বিষয়ে অনেকটা গবেষণা করি। সেই সমস্ত তথ্য জড়ো ক'রে ২০০৯-এর জানুয়ারী মাসে আমরা কলকাতায় একটা কর্মশালার আয়োজন করি। দ্বিভাষিক লেখালিখি ব'লে আমাদের প্রক্রিয়া জটিলতর। প্রথম যৌথ বইতে যেভাবে লিখেছিলাম, তার থেকে এবার আমরা কিছুটা সরে আসি। প্যাট কিছু লিখে আমাকে দেয়। আমি তার প্রত্যুত্তরে লিখি আরো কিছুটা। দুজনেই মূলত ইংরেজিতে লিখি। লেখা কিছুদূর এগোলে সেই পরিচ্ছেদের একটা বিষয়ভাবনা বা থিম সরের মতো ভেসে ওঠে। তখন আমরা দুজনেই নিজেদের ঐ-পর্যন্ত-লেখার কিছু রদবদল করি। তারপর আমি দুজনের লেখাই বাংলায় অনুবাদ করি। সব জায়গায় বিশ্বস্ত অনুবাদ হয় না, হলেও তাতে কাব্যরস ব্যহত হয়। ফলে অনুবাদের জায়গা নেয় "অনুসৃজন" (Transcreation)। অনুসৃজন অনুবাদের মতোই একটা ব্যাপার যেখানে জায়গায় জায়গায় মূল থেকে লেখা সরে আসে, নতুন পংক্তিও দরকারমতো সংযোজিত হয়, পুরনো পংক্তি বাদ পড়ে। এভাবেই একটা একটা করে পরিচ্ছেদ গড়ে ওঠে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষক আসে কোনো না কোনো কুবান বা লাতিন আমেরিকান বা ভারতীয় কি ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধরণ থেকে। উদাহরণ - Chorale Prelude/কোরেল আলাপ, সাবতেরানিও ব্লুজ/Blues Subterraneo, রাগ নিরাশাবরী/Raga Desperation, এলেজি বোলেরো/Bolero

Elegy, 'গীত কাফে'/Café Songs, Sonora Cinematic/সোনোরা সিনেমাতিক প্রভৃতি। বহু কুবান বাদ্যযন্ত্রের নামও কবিতার জায়গায় জায়গায় ব্যবহৃত।

কবিতার কিছু নমুণা রাখলাম -

শব্দ কি দ্বীপ
যেখনে বাসীন্দারা ক্রমাগত ছায়ার নিয়ম ফেলছে ?
ধরা যাক
ধরা যাক 'অস্পৃশ্য' শব্দটা
এক দেশে সে আইনের নাগাল পেরনো মাফিয়া
অন্য কোথাও ঘৃণিত প্রান্তিক
ছুঁয়ে দিলে
স্পর্শকাতরতাও নষ্ট

are words like islands
inhabitants dropping their constant shadows
on ?
take
take for example the word "untouchable"
an outlaw in one land
elsewhere a condemned hardscrabble
if they touch you
you lose the sense of it

***

সুর নরম করা হচ্ছিলো রীল থেকে রীলে
তবু
ঠিক কিভাবে এগোনো যায়
ঠিক কি রকমভাবে ভাঙা যায় বিশ্লেষণের কোড
এসব না ধরতে পেরে
আমার সমব্যথা বাড়ে

one noted reel-to-reel euphemisms
intimately
yet not able
to reveal the approach
to break the code of analysis
I continue the marked thrall of sympathy

***

every land dreams but not necessarily its
landscape
laced with a tapestry of sullen faces
of the humbled people we play for
on the harpsichord
a slow melody dying in Mozart's sonatina
every minute in piano dominant
bitter listening
due to illness caused by malnutrition
while two tropical birds in a cage
in beautiful economy
watch the city through the balcony's glass
door

তার ভূমি না দেখলেও সব দেশই স্বপ্ন দেখে
পাড়ে বোনা এক সারি মেঘাচ্ছন্ন মুখ
অতি গড়পড়তা এক সারি যাদের জন্য আমরা বাজাই হার্পসিকর্ডে
মিনমিনে মৃদু সুর মোৎসার্টের মৃতপ্রায় সনাটিনা
ঝিমিয়ে পড়ছে প্রত্যেকটা মিনিট পিয়ানো ডমিনেন্টে ফ্যাকাশে
তেতো শ্রবণ
যা অপুষ্টি থেকে আসে আসে জ্বোরোভাব
আর খাঁচার অপরূপ অর্থনৈতিক ভারসাম্যে
আটকানো দুটো গ্রীষ্মমন্ডলের পাখি
ব্যালকনির কাঁচদরজা ভেদ ক'রে দেখছে
শহর

***

==========

একদিকে বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে সংযোগ। বলা যায় বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ঘটে যাওয়া এক সংযোগ। এই চেন-সম্পর্কের কথা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। যদি এভাবে ভাবা যায়! ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কুবায় ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবের পরবর্তী সমাজে বেশ কিছু স্বাধীন চলচ্চিত্র পরিচালক সমাজসচেতনতার এক বিরল নিদর্শন রাখে। এরই কয়েক বছর পর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক কিছু শহর-কেন্দ্রিক ছবি তৈরি করছেন যেখানে ধ'রা পড়ছে তৎকালীন রাজনীতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। এমন নয় যে বাংলায় এই চলচ্চিত্রায়নের নেপথ্যে কাজ করছে কুবান প্রভাব। বরং প্রায় সমান্তরাল একটা ঘটনা ঘটছে। এরপর, সেই সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনা, তাকে ধরে রাখার শিল্পভঙ্গি, প্রায় চার দশক পর প্রভাব ফেলছে এক মার্কিন ও তার অভিবাসী বাঙালি বন্ধু কবির ওপর। তারা এই প্রভাবকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার রসে, নিজেদের সময়ে জারণ করে, সেঁকে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটা শিল্পে - কবিতায় - সেই বোধকে দিচ্ছে তার নিজস্ব প্রতিফলন। আর এই ঢেউ-এর সঙ্গে সহজাতভাবে জড়িয়ে পড়ছে 'মেমোরীস অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট'-এর ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার। আর 'প্রতিদ্বন্দ্বীর সিদ্ধার্থ'-এর চরিত্রাভিনেতা। শিল্প, রাজনীতি, সমাজ, সময়, স্মৃতির এই কুন্ডলীর কথা ভাবলে আমরা নিজেরাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। সে বিস্ময় ছুঁয়ে যায় আমাদের চারজনকেই। কিন্তু কারা এই চারজন ? চারজন ? নাকি এই প্রবন্ধে যাঁদের নাম করা হয়েছে, প্রত্যেকেই।

চলচ্চিত্র-শিল্প কোনো কোনো দেশে, যেমন কুবা, ইরান, আলবেনিয়া, অতীতের চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি, এমনভাবে গ'ড়ে উঠেছে যার সাথে গড়পড়তা ভারতীয় বা মার্কিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন না। এর কারণ এই যে চলচ্চিত্র মাধ্যমের মূল ব্যবহারটাই শেষোক্ত দেশগুলোয় বানিজ্যিক। কোনো আর্থ-সাম-রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে গ'ড়ে ওঠা সিনেমার চরিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকমের। আমাদের দেশে যে ধরণের ছবিকে একসময় 'আর্ট ফিল্ম' বলা হতো আর আজ যার অজস্র বিভ্রান্তিকর পরিভাষা তৈরি হয়েছে, সেই ধরণের ছবিই অন্য কোনো দেশে মেনস্ট্রিম বা মূলধারার ছবি। বিপ্লব-পরবর্তী কুবান সিনেমা একটা আদর্শবাদী, সামাজিক নান্দনিকতার জায়গা তৈরি ক'রে নেয়। এক সাম্প্রতিক লাতিন গবেষক একে 'revolutionary hermeneutics' বা 'বিপ্লবব্যাখ্যাশাস্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। বাতিস্তার আমলে যে স্বৈরশাসন গ'ড়ে ওঠে, সাধারণ সমাজকে আত্মঘাতী ক'রে তৈরি করেছিলো। আত্মহন্তা এক সমাজ, যারা স্বপ্ন দেখতে জানে না, পরিশ্রমের সদর্থ বোঝেনা, অনায়াসেই অশিক্ষা ও অলসতার শিকার হয়। বিপ্লব পরবর্তী কুবায় এই সাধারণ সমাজের অনেকটাই প্রথম কয়েক দশক সমাজবিপ্লবের মানে বুঝতে চায়নি। তমাস আলেয়াদের সিনেমার উদ্দিষ্ট ছিলো তারা। সরকারী উদ্যোগে শুধু যে এক সুস্থ সমাজ মনস্ক ছায়াছবি গড়ে উঠেছিলো তাই নয়, কোনোরূপ বানীসর্বস্বতার মধ্যে না গিয়েও, সেই সব ছবি সাধারণ সমাজকে উদ্দেশ্য ক'রে কথা বলতে শুরু ক'রে। সমাজের আয়না হ'য়ে উঠতে থাকে। এবং সিনেমার এমন একটা ভাষা তৈরি ক'রে ফেলে যা বিশ্বচলচ্চিত্র শিল্পে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দেয়।

ফিরে তাকিয়ে, ২৫ বছর পর 'মেমোরীস অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট' আবার দেখতে ব'সে এ কথাগুলোই আমার প্রথমে মনে হয়। 'অনুন্নয়নের স্মৃতি'তে তেমনভাবে কোনো কাহিনি ছিলো না। ছিলো কাহিনিচিত্রের এক ভান, যার সাথে সামাজিক ধারাভাষ্য, বিচ্ছিন্নকামিতা, তথ্যচিত্রের চরিত্র, নিউজরীল ; কুবার তৎকালীন নারীসমাজ ও ধর্ম, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে শ্লেষ ; সাহিত্য ও শিল্পের প্রথাগত কাঠামো সম্বন্ধে এক অনাস্থা - এই সমস্ত ভাবনার বীজ মিশে ছিলো। চিত্রভাষার মধ্যে স্বভাবতই এসে গিয়েছিলো এক বিমিশ্র, কোলাজ-চরিত্র। তমাস আলেয়ার সিনেমা শিক্ষা ইতালীতে। নিও-রিয়ালিস্ট ছবি, পরিচালক ও কলাকুশলীদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিলো। ছিলো বেশ কিছু ফরাসী চলচ্চিত্রশিল্পীর সাথে পরিচয়। 'নুভেল-ভাগ' সম্বন্ধে তাঁর টনটনে জ্ঞান। ১৯৬৮-র মে মাসে যখন পারী ছাত্র-আন্দোলন আর মলোটভ ককটেলে কাঁপছে, তার মধ্যেই 'অনুন্নয়নের স্মৃতি'র শো হ'য়ে যায় সেখানে। পরবর্তীকালে আলেয়া এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'গোদারদের ছবির সাথে কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের ছবির কিছু মিল পাওয়া গেলেও এটা বুঝতে হ'বে যে ওঁরা চলচ্চিত্র শিল্পকে সার্বজনিন ক'রে তুলতে এক বিশেষ আন্দোলন করছিলেন। সেই আন্দোলনের অনেক কিছুই ছিলো স্রেফ শিল্পের খাতিরে ক'রা পরিবর্তন, আর সে আন্দোলনের সবকিছু হয়তো সিনেমা প্রযোজনাকে ততোটা শস্তা রাখেনি চিরকাল, কিন্তু আমাদের ছবিগুলো গ'ড়ে উঠছিলো ব্যক্তি বা শিল্পের প্রয়োজনে নয়, সমাজের প্রয়োজনে। আর তার দর্শক ছিলো বৃহত্তর সমাজ।' সোয়া-শতক পেরিয়ে এসে 'অনুন্নয়নের স্মৃতি' দেখতে ব'সে এই কথাগুলোই পর্দার ওপর মোটা অক্ষর হয়। ১৯ বছর বয়সে এই ছবি কলকাতায় ব'সে দেখতে পেরেছিলাম ম'নে করে নিজেকে যেমন ভাগ্যবান মনে করি, তেমনি কলকাতার ওপরও বাড়তি মায়া পড়ে। আমাদের কতকিছু শিখিয়েছিলো কলকাতা। আমরা তার যথেষ্ট দাম দিতে পারিনি।

কিছু পরিবর্তনও টের পাই এই পুনর্দেখার মধ্যে। খুব আত্মিক কিছু পরিবর্তন। যা আজ যুগের হাওয়ায় কিছুটা বেমানান লাগে। হয়তো আমার ব্যক্তিগত পরিবর্তনও এসবের জন্য দায়ী। সোয়া-শতক আগে ছিলাম ১৯ বছর বয়সী এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছাত্র। এখন যুক্তরাষ্টের বাসীন্দা এক বাঙালী লেখক। এই সোয়া-শতকে দুটো মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেছে আমাদের পৃথিবীতে। শীতযুদ্ধ শেষ হয়েছে, প্রায় মিলিয়ে গেছে কম্যুনিজম, ছিঁড়ে গেছে লৌহ-যবনিকা, ভেঙে গেছে ইস্টার্ণ-ব্লক। আর 'খোলা বাজারের হাওয়া/ চুপিসাড়ে করে ধাওয়া' এনে দিয়েছে ইন্টারনেট অধ্যুষিত এই বিশ্বায়ন। সেখানে দাঁড়িয়ে সেরজিওর বেশ কিছু মন্তব্যকে, বিশেষ ক'রে ফ্রান্স সম্বন্ধে কোনো কোনো মন্তব্যকে জাতিদোষে দুষ্ট ম'নে হয়। মেয়েদের প্রতি তার শ্লেষ ও মনোভঙ্গিকেও মাঝে মাঝে misogynistic মনে হ'তে শুরু করে। 'সভ্যতার প্রভু' হিসেবে সেরজিও বারবার ফ্রান্সের দিকে আঙুল দেখায়। অতীতের কুবায় যারা ছিলো প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি। স্বভাবতই এই জাতি-উষ্মা। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই আমরা আমাদের বইতে লিখেছিলাম -

Europe floats in the liquid dream of a small island
but even bigger islands stay afloat
they put their arms around me
sullen faces from a roof
how should I know
if the one outfront's not underperforming

সিনেমা যেভাবে দেখানো হয় তার কথা ভাবি। কারো অনুভূত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা লেখা বা ভাবনা তৈরি হলো। জীবন্ত ভাবনা, তাজা লেখা - কিন্তু যে অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, তা অতীত। সেই বানানো বা সাজানো অতীতকে আবার জীবন্ত ক'রে, আজকের ক'রে, ফিল্ম তোলা হলো। ক্যামেরার চোখের সামনে মানুষ ও শহরকে দিয়ে নিজেদের মনের

মতো করে আবার পুনর্গঠন করা হলো সে অতীত বাস্তব। সেই সিনেমা, আধা-অন্ধকার ঘরে, আপনার পেছন থেকে প্রজেক্টার চালিয়ে আপনার সামনে ফেলে এমনভাবে দেখানো হলো যেন তা "এই মুহূর্তের বাস্তব"। দূরের, অন্যত্রের বাস্তব চোখের সামনে এসে আপনার নিজের হলো। কখনো স্মৃতির ভূমিকাও অনেকটা এইরকম। পেছন থেকে সন্তর্পণে জীবনের চেয়েও দীর্ঘকায় রূপ নিয়ে সামনে আসে - projected, so as to make it larger than life। আমরা শিহরণে শিহরণে তড়িতস্পৃষ্ট হই।

১৯৮৪ সালে যেদিন যাদবপুরের গান্ধী ভবনে "মেমোরীস অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট" দেখে বেরিয়ে এসে বেঙ্গল ল্যাম্পের বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছবিটার কথা ভেবেছিলাম, সেদিন বাসস্টপের কোণে এক ভবিষ্যভূত ছিলো হয়তো, যার অস্তিত্ব টের পাইনি। সে এগিয়ে এসে কথা বলেনি। অথচ বলতেই পারতো। যদি সেদিন ভবিষ্যতের সেই ভূত আমায় বলতো যে এই কাহিনির রচয়িতা, ঔপন্যাসিক এদমুন্দো দেসনোয়েস, যিনি এই ছবির সহ-চিত্রনাট্যকার, যিনি স্বচরিত্রে ছবিটার এক জায়গায় অভিনয়ও করেছেন - লেখকদের এক রাউন্ডটেবিলে, চুরুটে টান দিয়ে কুবার ভবিষ্যত সাহিত্য সম্বন্ধে গুরুতর মন্তব্য করছিলেন, আর অফ-ভয়েসে সেরজিও তার ওই ইউরোপীয় অভিব্যক্তি, নেশা ও চিন্তাপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করছিলো, তার উত্তর-ঔপনিবেশিকতার নিচে দাগ টেনে দিতে চাইছিলো- ভবিষ্যভূত যদি সেদিন আমায় বলতো যে আজ থেকে ২৫/২৬ বছর পর এই এদমুন্দো দেসনোয়েস আমার ও প্যাটের অসমবয়সী বন্ধু হয়ে উঠবেন, ওঁর নতুন উপন্যাস আমায় পড়াতে চাইবেন, আমাদের কবিতা প'ড়ে মুদ্ধবাক হবেন - এসব আমি বিশ্বাস করতাম না। সে রোমাঞ্চের খিদে থাকুক বা না থাকুক, এতটা নিতে পারতাম না। কিন্তু সত্যিই তাই হলো। প্যাট একদিন দেসনোয়েসকে খুঁজে বের করলো। দেখা গেলো উনি আজ নিউ ইয়র্কের বাসীন্দা। কুবা ছেড়েছেন বহুদিন। বয়স ৭৯-৮০, আজও চুরুট খান এবং মোটের ওপর সুস্থই। বিগত ৪ দশক ধরে কলকাতায় যে এত তরুণ তরুণী এই ছবিটা দেখেছেন, ভালোবেসেছেন - এসব জেনে দেসনোয়েস চমকে যান এবং বাংলা ও বাঙালীর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লেন। আমাকে একবার ইমেলে লিখলেন, "তোমার চেয়ে আমার নিজের রোমাঞ্চ কিছু কম নয়, আমিগো। আমার কোনো ভারতীয় বন্ধু নেই। কোনোদিনই ছিলোনা। এই প্রথম। আমি তোমার দিকে হাত বাড়াচ্ছি। আর কলকাতা সম্বন্ধে আমি ভীষণ উৎসাহী হয়ে উঠেছি হঠাৎ। এই যোগাযোগের কোনো জবাব নেই। একবার এসো নিউ ইয়র্ক, আমাদের দেখা হোক। মিগুয়েল কোয়ুলা আমার নতুন উপন্যাস নিয়ে এক দারুণ ছবি করেছে। সেটা তোমায় দেখাতে চাই।"

২০১১-র মাঝামাঝি "The Memorandum/মৌ" যখন শেষ হয়, লেখাটা নিয়ে আমার মধ্যে হঠাৎ এক গভীর অতৃপ্তি আসে। কেন ? জানি না। এর ফলে প্যাটের অসুবিধে হতে থাকে। লেখাটাকে ঘিরে তার একটা প্রত্যয় ছিলো। সেই সময়েই আমি প্রস্তাব রাখি যে পাণ্ডুলিপি দেসনোয়েসকে পাঠানো হোক। ওঁকে অনুরোধ করা হোক ভূমিকা লিখতে। যদি উনি ভূমিকা না লিখতে চান, বা যদি ওঁর ভূমিকায় উচ্ছ্বাস না থাকে, তবে এই বই ছাপার কোনো মানে নেই। প্যাটের অস্বস্তি সত্ত্বেও আমি তাই করি। পাণ্ডুলিপি পাঠাই দেসনোয়েসকে। বাকিটা, ক্রমশ প্রকাশ্য।

সেরজিও ও সিদ্ধার্থ। দুই যুবক। একজন মেমোরীস এর নায়ক। নায়ক দেসনোয়েসের উপন্যাসের। তমাস আলেয়ার ছবির। অন্যজনও নায়ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের। সত্যজিত রায়ের ছবির। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। দুজনের ম-ধ্য মিল রয়েছে এক জায়গায়। তারা বামপন্থাকে সমর্থন করে। সমাজবিপ্লবকে সমর্থন করে, কিন্তু তার সব দিক দেখতে চেষ্টা করে। সমাজের সর্বত্র ধারণা আর সত্যের মধ্যে, আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে যে ফাঁক সেটা তাদের ক্রমাগত উদাসীন করে। সন্দিহান। ডিস-এনগেজড। বিচ্ছিন্নতাকামি। একজন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে টেবিল উল্টে দিয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু মিছিলের একজন হ'তে চায় না, অন্যজন মরা পাখি ওপরের বারান্দা থেকে জনবহুল রাস্তার মানুষের ওপর ফেলে দেয় - অবলীলাক্রমে। এই কবিতা যখন লিখছি, প্যাট কলকাতা থেকে আনা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিটা আবার দেখতে শুরু করে, মৃণাল সেনের 'পদাতিক'। একইসঙ্গে অবধারিতভাবেই সে ধৃতিমান চটোপাধ্যায়ের ফ্যান হয়ে উঠতে থাকে। ৮০-র দশকে, আমরা যারা বয়ঃসন্ধি পেরোই, প্রায় সকলেই ধৃতিমানকে অসম্ভব পছন্দ করতাম। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থ ও 'পদাতিক'-এর সুমিতের সঙ্গে আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরি একটা আত্ম-শনাক্তিকরণ ছিলো। ইতিমধ্যে আচমকাই ফেসবুকে, ধৃতিমানের সাথে আমার আলাপ হয়ে যায়। আলাপ সৌহার্দ্যের পর্যায়ে গড়ায়। ২০১০-এর গ্রীষ্মে কলকাতায় ওঁর ফ্ল্যাটে একবার দেখা করি। অল্প আড্ডা হয়। ৭০ দশকে সত্যজিৎ ও মৃণালের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই ছিলো (যা অনেক সময়েই সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসতো, যাকে খুব ঠান্ডা বলাও বোধহয় যায় না)। এমনকি, চলচ্চিত্র-আলোচকদের মধ্যেও একটা স্পষ্ট বিভাজন ছিলো। এদের বাইরে একটা তৃতীয় স্কুল ছিলো ঋত্বিক ঘটকের। সত্যিই বলতে কি খুব কম নায়ক-নায়িকাই এঁদের তিনজনের সঙ্গেই কাজ করেছেন। মাধবী মুখোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত দুই অত্যন্ত বিরল উদাহরণ। নায়কদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় যে 'আকাশ কুসুম'-এর পর সৌমিত্র সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে পড়েন মৃণাল সেন। 'মহানগর'-এর পর অনিল চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সত্যজিৎ। ৭০-৮০'র দশকে একমাত্র ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় দুজনের ছবিতেই সমান গুরুত্ব নিয়ে আবির্ভূত। তদুপরি, ধৃতিমান এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে যেটা বলেছিলেন - 'আমি কোনোদিন ওই ইঁদুর-দৌড়ে নামিনি', সেই কারণেই তরুণ লেখক/শিল্পী/বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক বাড়তি শ্রদ্ধা আছে ওঁর ওপর। কবিতা জগতের অনেকের থেকেই শুনি ধৃতিমান তাঁদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা।

"The Memorandum/মৌ" এর কথা মাঝে মাঝে ওঁকে বলতাম। শেষ পর্যন্ত ধৃতিমানদা সিনসিন্যাটি এলেন। বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানের দুদিন আগে আমার স্টাডিতে ব'সে যেদিন প্যাটের সাথে আমরা তিনজনে পাঠ-মকশো করছি, এক বহু

পুরনো কথা আচমকা মনে পড়ে গেলো। ১৯৮১ সালের সেই সন্ধ্যার কথা যা আগেই এই কলমে লিখেছি। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানটার কথা। সেদিন শক্তির কবিতার ইংরেজি আবৃত্তির জন্য অপর্ণা সেন ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। অপর্ণা আসতে পারবেন না, সেটা গীতা আন্টি (ঘটক) মঞ্চে উঠেই জানালেন। আশা ছিলো ধৃতিমানের আবৃত্তি শুনতে পারবো। সে যুগে 'আবৃত্তি'র চলটাই ছিলো বেশি। 'কবিতাপাঠ' লোকজন তেমন টানতো না। আগেও বোধহয় লিখেছি, সেদিন ১৭ বছর বয়সে সম্ভবত সেই প্রথম বাড়ি থেকে অতদূরে গিয়েছিলাম একা। রাত নটার পর বাস ক'মে আসে। দুরু দুরু মন নিয়ে রবীন্দ্র সদনের সামনে, আঁধারি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, একটাই খেদ জ'মে উঠেছিলো। ধৃতিমানের কন্ঠে শক্তির ইংরেজি কবিতাপাঠ শোনা হলোনা। সেই বাসস্টপেও হয়তো সেদিন ভবিষ্যতের ভূত ছিলো ছুপা-রুস্তম হ'য়ে। সেদিনও সে সলজ্জ অশরীরী এগিয়ে এসে কথা বলেনি। বলেনি, 'আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর পর, একদিন, এই নভেম্বর মাসেই, তোমার এই দুঃখ ঝ'রে যাবে। সেদিন শক্তি থাকবেনা। তবু ধৃতিমান পড়বেন। এবং তোমার কবিতা।' যদি বলতো বিশ্বাস করতাম না। ভূতেও না, ভবিষ্যতেও না। কিন্তু যা বলছিলাম একটু আগে - সিনেমা দেখানোর পদ্ধতিটাই ওইরকম। পেছন থেকে প্রক্ষেপ ক'রে দেখানো, জীবনের চেয়েও বড়ো ক'রে দেখানো - projected, so as to make it larger than life ।

এদমুন্দো দেসনোয়েসের লেখা বইয়ের ভূমিকা দ্রুত আসায় আমি ও প্যাট, উভয়েই একটু উত্তেজিত হয়ে উঠি। লেখাটা জটিল এবং শেষের মাসগুলোয় লেখা তার পরিণতির দিকে প্রায় শামুকের গতিতে এগোচ্ছিলো। ২০০৯ সালের পরে আমরা এ লেখা আর কোথায় পড়িনি, এর কোনো টুকরো পাঠাইনি কোনো কাগজে। বিশেষত কবিতার বাংলা ভার্সান কোথাও প্রকাশিত হয়নি। দেসনোয়েসের সপ্রশংস ভূমিকার বাহবায় আমার অবসাদ ও গ্লানি কেটে যায়। এক জায়গায় দেসনোয়েস লিখেছেন,

"I was surprised and moved to read *The Memorandum* by Pat Clifford and Aryanil Mukherjee ..... now along comes *The Memorandum*, where I discover the resonance of the character and the narrative of my book, a memoir that struggles with the inner self awareness of existence in an underdevelopment island – island implying isolation. Underdevelopment does embrace the isolation of others.....Clifford and Mukherjee ..... in ..... their bilingual poem with its mysterious script is not surface, like a commercial ad or a Twitter message, it seeks depth, hopes to bring light to darkness:

"*first there was light... its velocity continues to fall outside the range of emotions later ran sound gradually trains advanced motor cars films also went past us at their usual pace past... backward us*".

As the Spanish thinker, Ortega y Gasset wrote: "*yo soy yo y mi circunstancia*" – I am myself and my circumstance. Both *Memories of Underdevelopment* and *The Memorandum* are aware that we are not only our colorful circumstance but also our individual consciousness, our inner discourse rooted in our land and its inhabitants.

Our world is a palimpsest, we all erase and rewrite it"।

ইতিমধ্যে ধৃতিমানদাও পান্ডুলিপি পড়ে ওঁর ভালোলাগার কথা জানান। উনি ব্যক্তিগত কারণে ২০১১-র শীতের গোড়ায় আমেরিকায় আসবেন জানান। ওঁর বিশেষ আগ্রহে নভেম্বরের শেষের দিকে সিনসিন্যাটি শহরে এক যৌথ পাঠ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সেদিন সারা সন্ধ্যা জুড়ে বৃষ্টিবাদল। সিনসিন্যাটির উত্তরে প্রেয়রি আর্ট গ্যালারি (http://www.prairiecincinnati.com)। নিচে একটা রেস্তঁরা। ডেভিড রোসেনথাল নামে এক শিল্পী এই গ্যালারি চালান। সেখানেই পাঠ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। চিজ ও সুরা সহযোগে প্রথম এক ঘন্টা ধৃতিমানের সাথে আমেরিকান শ্রোতা/দর্শকরা পরিচিত হন। পরের ঘন্টায় প্রথমে আমরা 'The Memorandum/মৌ' থেকে যৌথভাবে পড়ি ৩-৪টে পরিচ্ছেদ। সেই পাঠের একটা ছোটো ভিডিও এখানে পাওয়া যাবে - http://youtu.be/T_t1Ht3jWi8 (ভিডিওচিত্রিঃ বারবারা উল্ফ)। পাঠ শেষে আমাদের পেছনে দেয়ালে লাগানো পর্দায় ধৃতিমান দেখান ওঁর পাঁচটা নির্বাচিত ছবির কিছু অংশ। সত্যজিত রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ও 'আকালের সন্ধানে' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। জীবন, শিল্প ও রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের কুন্ডলী-আকার পরিভ্রমণের কথা দিয়েই ধৃতিমানও শুরু করেন ওঁর আলোচনা - এই যে, আলেয়া চেয়েছিলেন "মেমোরীস অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট" ছবিটা দ্রুত

পুরনো হয়ে যাক। কিন্তু প্রাচীনায়ন তার ভাগ্যে নেই বোধহয়। চার দশক পরেও সেই ছবি থেকে উদ্বুদ্ধ আমাদের বই। তরুণ মার্কিন-কুবান পরিচালক মিগুয়েল কোয়ুলার সাম্প্রতিক ছবি "মেমোরীস অফ ওভারডেভলপমেন্ট"-এর প্রসঙ্গও ওঠে। অতি-উন্নয়নেরো অনেক উপসর্গ রয়েছে যা অনুন্নয়নের মতো বা তার চেয়েও ভয়ংকর। এক জ্বলন্ত উদাহরণ - স্বাস্থ্য। অপুষ্টির চেয়ে অতিপুষ্টি কোনো অংশে কম ক্ষতিকারক নয়।

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনা
ছবি ঃ মিচেল ক্লিফর্ড

বিচ্ছিন্নতাকামি জনচরিত্র, তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা উপন্যাস, যাকে অবলম্বন করে ছায়াছবি - অথচ সেই ছায়াছবির মানুষরা, তার বিমুগ্ধ গ্রাহকরা নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন - এই প্রহসনের নামই হয়তো জীবন। সিনসিন্যাটিতে থাকার সময়েই ধৃতিমানদার সাথে এদমুন্দো দেসনয়েসের যোগাযোগ হয়। কয়েক সপ্তাহ পর দুজনের দেখা হয় নিউ ইয়র্ক শহরে। ধৃতিমানদার চিঠিতে জানলাম - 'আড্ডা' জিনিসটা আর শব্দটা - এদমুন্দো দেসনয়েস এখন দুটোই বোঝেন । বেশ ভালোভাবেই।

"প্রতিদ্বন্দ্বী" প্রসঙ্গে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের ভিডিওসূত্র -
http://youtu.be/p5bk1g7yPu8
ভিডিওচিত্রিঃ বারবারা উল্ফ